বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

একান্ত সাক্ষাৎকারে স্যার ফজলে হাসান আবেদ

দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পক্ষে নয় বর্তমান রাজনীতি

দেশের বেসরকারি খাতের ব্যাংক ব্র্যাক পার করেছে এক যুগ। যুগপূর্তির প্রাক্কালে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান স্যার ফজলে হাসান আবেদ একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলেন বণিক বার্তার সঙ্গে। এতে তিনি ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, দেশের রাজনীতি-অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি ও সংকট থেকে উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন। স্যার ফজলে হাসান আবেদ বলেন, আমাদের রাজনীতি দেশের ওপর অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পক্ষে নয়। বর্তমান রাজনীতি থেকে দেশ যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হবে, ততই মঙ্গল। নতুন প্রজন্ম যদি ইতিবাচক রাজনীতি করে, তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশের এমন চেহারা থাকবে না। আমাদের দেশের রাজনীতি জনগণের ওপর বিরাট বোঝা। আশা থাকবে, এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত, দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। তিনি আরো বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। যদি রাজনীতিকরা একত্রে বসে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করেন, তাহলে অনেক সংকট থেকে জাতি মুক্ত হতে পারবে। সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন ঠিকমতো অনুষ্ঠিত ও একটি নতুন সরকার গঠিত হলে তবে বর্তমান ক্ষমতাসীন বা যে দলই দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আসুক, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান হবে বলে ধারণা। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনীতিকদেরই খুঁজে বের করতে হবে। সবাইকে পৌঁছতে হবে ন্যূনতম ঐকমত্যে। দেশ ও জনগণের মঙ্গলের বিষয়টি চিন্তায় রেখেই রাজনীতি করতে হবে।

সাক্ষাৎকারটি পড়ুন পৃষ্ঠা ৬

সাক্ষাৎকার

স্যার ফজলে হাসান আবেদ, কেসিএমজি (নাইট কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড সেন্ট জর্জ); বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন এবং ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান। তিনি সামাজিক নেতৃত্বের জন্য ১৯৮০ সালে র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড, ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো নোমা পুরস্কার, ১৯৯০ সালে অ্যালানশন ফেইনস্টেইন ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার পুরস্কার, ২০০২ সালে দ্য শোয়াব ফাউন্ডেশন সোশ্যাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যাওয়ার্ড, ২০০৪ সালে গেটস অ্যাওয়ার্ড ফর গ্লোবাল হেলথ, ২০০৭ সালে হেনরি আর ক্রাভিস প্রাইজ ইন লিডারশিপ, ক্লিনটন গ্লোবাল সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আজীবন সম্মাননা, ২০০৮ সালে ডেভিড রকফেলার ব্রিজিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, ২০১০ সালে নাইটহুড উপাধি, ২০১১ সালে ওয়াইজ প্রাইজ এবং ২০১৩ সালে ওপেন সোসাইটি প্রাইজ অর্জন করেন।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের এক যুগপূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি তিনি বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় ব্র্যাক, ব্র্যাক ব্যাংক, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পদ্মা সেতু, দারিদ্র্য বিমোচনসহ নানা বিষয় উঠে আসে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এমএম মুসা ও সাকিব তনু**

নতুন নেতৃত্ব তৈরিতে সময় দিতে হবে

এক যুগ পার করল ব্র্যাক ব্যাংক; যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন আপনারা, সেটি পূরণের কোন পর্যায়ে রয়েছেন?

লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা, যাতে তারা দেশে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে। সে লক্ষ্যে আমরা অবিচল রয়েছি এখনো। আমি মনে করি, সে লক্ষ্য অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এখন ব্যাংকটির গ্রাহকসংখ্যা (ক্ষুদ্র ও মাঝারি) চার লাখের ওপরে। তারা প্রায় ১০-১২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। সেদিক দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক সফল বলা চলে।

এসএমই ঋণের পথ প্রদর্শক ব্র্যাক ব্যাংক। অন্যান্য ব্যাংক এখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে এগিয়ে আসছে। আমরা যে আকারে দিচ্ছি, সে আকারে হয়তো অন্যান্য ব্যাংক এসএমই ঋণ দিচ্ছে না। তবে এখন অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে, যাতে এ খাতে বিনিয়োগ করা যায়।

ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃজন; আরেকটি লক্ষ্য ছিল মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল ব্যাংকিং। আগে বলা হতো মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংকিং; সেখানে ব্র্যাক ব্যাংক কাজ করছে মূল্যবোধের ওপর। মূল্যবোধ আমাদের তিনটি। মুনাফা তার মধ্যে অন্যতম, সন্দেহ নেই। যেকোনো ব্যবসায় মুনাফা থাকবেই। মুনাফা ছাড়া ব্যবসা চলবে না। তবে আমরা তিনটি মন্ত্রে বিশ্বাস করি। তা হলো— মানুষ (পিপল), পৃথিবী (প্ল্যানেট) ও মুনাফা (প্রফিট)। আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে ভালোভাবে রক্ষা করতেই এ তিন মন্ত্র বা থ্রিপি। পরিবেশ রক্ষায় আমাদের অনেক বিনিয়োগ রয়েছে। গ্রিন এনার্জিতে বিনিয়োগ করছি। মানুষের যেখানে উন্নতি হবে, সেখানেই আমরা জোর দিতে চাই। এ কারণে আমরা 'থ্রিপি' অর্থাৎ পিপল, প্ল্যানেট ও প্রফিটের ওপর জোর দিচ্ছি। এ তিনটি মূল্যবোধের ওপর জোর দিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান চলছে। এটি বাংলাদেশের জন্য নতুন এক ধারণা।

জামানতবিহীন এসএমই ঋণ প্রদানে ঝুঁকি কীভাবে সামলাচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক?

বন্ধক রাখার মতো সামগ্রী আছে, সে আগেও ঋণ পেত, এখনো পায়। কিন্তু যার বন্ধক রাখার মতো সম্পদ নেই, তার ক্ষেত্রে সমস্যা। বন্ধক রাখার ক্ষমতা নেই বলে তারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। যাদের বন্ধক রাখার ক্ষমতা নেই, তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে ব্যাংক অংশীদারি বিনিয়োগ করে। কিন্তু আমাদের এখানে সেটি করা হয় না বাজার ও অর্থনীতি ততটা পরিপক্ব ও সংগঠিত হয়নি বলে। এ কারণে এখানে ঋণই দিতে হয়। যদিও আমরা একটু বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি। এসব বিষয় ভালোভাবে অনুধাবন করা গেলে আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা— ঋণ ফেরত আসে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমরা যখন দেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তন করি, তখনো বলা হতো, 'গরিব মানুষ ঋণ ফেরত দেয় না।' কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা ঋণ ফেরত দেয়। প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণের দেশ। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও আশা— এ তিনটি বড় প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে। এর মানে দাঁড়ায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণ নিয়ে তা সময়মতো ফেরত দেয় এবং তাতে তারাও লাভবান হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে একই রকম মূল্যবোধ রয়েছে। বড় বিষয় হলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নির্ণয় করা। এটি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ওপর। আমাদের কর্মীদের আমরা এটাই শেখাচ্ছি যে, কেবল কাগজপত্র দেখে নয়; তার মজুদ কী আছে, কত দিন ব্যবসা করছে, সবাই তাকে চেনে কিনা প্রভৃতি দেখেই ঋণ দিতে হবে। সেভাবেই ঋণ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক। আমাদের এসএমই ঋণের ৯২ শতাংশই জামানতবিহীন। জামানতবিহীন বলেই যে আমরা বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি, তা মনে করি না।

ব্র্যাক ব্যাংক নিয়ে আপনার স্বপ্ন কী?

ব্র্যাক ব্যাংক বিশ্বাস করে, দেশের জন্য কোনো অবদান রাখতে হলে বড় আকারে তা না করলে সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। সেজন্যই ব্র্যাক আজ বিশ্বের বৃহৎ একটি সংস্থা। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে আমরা একটা ইতিবাচক উন্নয়ন দেখতে চাই। এজন্য আমি চাই, ব্র্যাক ব্যাংকও একটি বড় ব্যাংক হোক। কর্মসংস্থান তৈরি করে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে এটি ভূমিকা রাখুক।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তার মূল কারণ কী বলে মনে করেন? এখান থেকে উত্তরণের পথইবা কী?

সংকট তৈরি হচ্ছে মূলত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে; যেগুলোয় সরকারের অংশীদারিত্ব বেশি। সব সরকারই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে। এটা অনেকটাই পক্ষপাতদুষ্ট। বেশির ভাগ পরিচালনা পর্ষদেই সরকারদলীয় লোকজন থাকে। এরপর তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো যাতে ভালোভাবে চলে, সেটি দেখভাল করার দায়িত্ব সরকারের। এখানে প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকার। ব্যাংক পরিচালনার পূর্ণ ধারণা যার আছে, তার নেতৃত্বে একটি ব্যাংক ভালোভাবে চলতে পারে। নইলে সমস্যা তৈরি হতে থাকবেই।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে?

বাংলাদেশ ব্যাংক ভালো ভূমিকাই রাখছে। বেসরকারি ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারা বেশ কড়াকড়িভাবে অডিট করে, নিয়মিত বিরতিতে ভালো পরামর্শ দেয়। কিছুদিন আগেও ব্র্যাক ব্যাংকে অডিট করতে এসেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আমাদের কী কী সমস্যা রয়েছে, সেগুলো তারা বলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের খুব যে ত্রুটি রয়েছে, তা আমি বলব না। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা সীমিত। আমার মনে হয়, বাংলাদেশ ব্যাংককে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া উচিত ব্যাংক ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণে। সব ব্যাংকের প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়ে অডিট করা উচিত।

ব্যাংকগুলোয় নেতৃত্ব ও সুশাসনের সংকট রয়েছে বলে মনে করেন?

নেতৃত্ব ও সুশাসনের সংকট আছে বৈকি। গত দুই দশকে নতুন নতুন ব্যাংক তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। পুরোনো ব্যাংকগুলো তাদের শাখা ও কার্যপরিধি বিস্তৃত করেছে। সম্প্রতি আরো নয়টি ব্যাংক বাজারে এসেছে। নতুন ব্যাংকে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। এতে দ্রুত পদোন্নতি হচ্ছে অনেকের। বেসরকারি ব্যাংক বৃদ্ধি অনুপাতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাওয়া কঠিন। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে এটা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের অর্থনীতিও দ্রুত এগোচ্ছে। আরো নয়টি ব্যাংক এসেছে বলে আমাদের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। তারা ব্যবসা করতে পারবে না, তেমনটা ভাবারও কারণ নেই। নতুন নেতৃত্ব তৈরি হতে সময় লাগবে। সে সময়টা আমরা দিচ্ছি না।

নতুন ও দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ যে একেবারেই নেয়া হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। আমরা নানাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পর্যায়ে যেতে সংশ্লিষ্ট খাতে একজনের ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সেটি হয়তো এখন দেখা সম্ভব হচ্ছে না। একই সমস্যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও। পর্যাপ্ত অধ্যাপক নেই। ফলে সহকারী অধ্যাপককে দ্রুত সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিতে হচ্ছে। এমন ঘটনা হয়তো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ঘটছে।

আপনার অবর্তমানে ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কাঠামোটি কেমন হবে? কোনো সংকট দেখা দেবে বলে মনে করেন কি?

ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে তেমন সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না। আমি ৩০ বছর ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ছিলাম। ১০ বছর ধরে কাজ করছি ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হিসেবে। নতুন নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকও রয়েছেন, যিনি ব্র্যাকের ব্যবসার দিকটা দেখেন। এ দুই পরিচালক বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। ফলে আমার অবর্তমানে ব্র্যাক বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা হবে না; বরং কাজে গতিশীলতা বজায় থাকবে বলে মনে করি। আমি নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পর গত ১০ বছরে ব্র্যাক বিভিন্ন দেশে তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। কাজেই নির্বাহী দায়িত্ব ছাড়ার পর ব্র্যাক থেমে গেছে তা নয়, বরং এর গতিশীলতা বেড়েছে। প্রথম কয়েক বছর ব্র্যাক ব্যাংকে আমি পরিচালনা পর্ষদে ছিলাম না; কিন্তু আমার অবর্তমানে ব্যাংকটির প্রবৃদ্ধি থেমে থাকেনি। অনেক আগে থেকেই নেতৃত্ব তৈরি করেছি, যাতে ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক কার্যক্রমকে কীভাবে দেখছেন?

গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ খুবই দুঃখজনক। এসবের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি না। ব্যাংকটি যেভাবে চলছিল, সেভাবেই চলতে দেয়া উচিত। একে নতুনভাবে সাজানোর কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ব্যাংকটিতে কোনো সমস্যা-সংকট ছিল না। সেখানে কোনো আর্থিক কেলেঙ্কারিও হয়নি। গ্রামীণ ব্যাংক লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংকের ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ অপ্রয়োজনীয় ও অনভিপ্রেত।

BRAC BANK
আস্থা অবিচল

> ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃজন; আরেকটি লক্ষ্য ছিল মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল ব্যাংকিং। আগে বলা হতো মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংকিং; সেখানে ব্র্যাক ব্যাংক কাজ করছে মূল্যবোধের ওপর। মূল্যবোধ আমাদের তিনটি। মুনাফা তার মধ্যে অন্যতম, সন্দেহ নেই। যেকোনো ব্যবসায় মুনাফা থাকবেই। মুনাফা ছাড়া ব্যবসা চলবে না। তবে আমরা তিনটি মন্ত্রে বিশ্বাস করি। তা হলো— মানুষ (পিপল), পৃথিবী (প্ল্যানেট) ও মুনাফা (প্রফিট)। আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে ভালোভাবে রক্ষা করতেই এ তিন মন্ত্র

এটা শুধু গ্রামীণ ব্যাংক নয়, সরকারের পদক্ষেপ, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মনে হচ্ছে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর ক্ষোভ থেকে তারা এগুলো করছে। অথচ বিশ্বে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি, নোবেলজয়ী। তাকে এভাবে অপমান করে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ থেকে সরিয়ে দেয়া যৌক্তিক হয়নি। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গড়া প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা আমাদের দেশের মানুষ তো বটেই, বিদেশের সরকার ও জনগণও খুব অপছন্দ করছে। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংককে ফিরিয়ে আনতে সংস্থাটির প্রধানকে অনুরোধ করেছিলেন। এর সঙ্গে নিজেকে কেন যুক্ত করলেন?

এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন মনে হলো, যেহেতু আমি যাচ্ছি, সেহেতু বিশ্বব্যাংকের প্রধান হয়তো পদ্মা সেতুর প্রসঙ্গটি তুলবেন। তখন অর্থমন্ত্রীকে ফোন করে তার কোনো বক্তব্য আছে কিনা, তা জানার চেষ্টা করি। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহর রিজভী সাহেবকে ওয়াশিংটনে পাঠান। মূলত আমি চেষ্টা করেছিলাম, পদ্মা সেতু প্রকল্পটিতে বিশ্বব্যাংককে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। আমার সঙ্গে আলোচনার পর তারা এগিয়েছিলও বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো কিছু হলো না।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

আমার ধারণা, পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করলে বাংলাদেশের জন্য অনেক সুবিধা হতো। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাইলে অন্যান্য প্রকল্প, যেখানে সরকারের অর্থায়নের কথা ছিল, সেগুলো ব্যাহত হবে। রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবকাঠামোর উন্নয়নে এখনো আমাদের অনেক অর্থ প্রয়োজন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির নির্ধারিত অর্থ পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে চলে গেলে অন্যান্য প্রকল্পে বরাদ্দ কম হবে। আমাদের সম্পদ সীমিত। এর মধ্যে ৩০০ কোটি ডলার পদ্মা সেতু নির্মাণে চলে গেলে আমাদের অসুবিধা হবে। তাই মনে করি, পদ্মা সেতু প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে করা উচিত নয়। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের ঋণের সুদহার ও শর্ত সহজ ছিল।

ব্র্যাক লাভজনক ও অলাভজনক— দুই ধরনের কার্যক্রমই পরিচালনা করে। অভিযোগ রয়েছে, অলাভজনকের চেয়ে লাভজনক ব্যবসার দিকে ব্র্যাক এখন বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

ব্র্যাক সংগঠনটি অলাভজনক। কাজেই লাভজনক ব্যবসা শুরু করলেও এর মুনাফা যায় অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ ব্র্যাকে। কোনো একক ব্যক্তি এর সুফল ভোগ করে না। এটাকেই আমরা সামাজিক উদ্যোগ (সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ) বলি। বিষয়টিকে ওভাবেই বিবেচনা করতে হবে। এর দুটি দিক রয়েছে— প্রথমত, এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তিগত মালিক বা শেয়ারহোল্ডার নেই। দ্বিতীয়ত, এগুলো হলো সামাজিক উদ্যোগ। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সামাজিক ব্যবসা নিয়ে অনেক কথা বলছেন। ৩০-৩৫ বছর ধরে আমরাও এমন অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। উদাহরণস্বরূপ আড়ংয়ের কথা বলতে পারি। প্রতিষ্ঠানটি গড়া হয়েছিল গ্রামগঞ্জের মানুষ, যারা কুটিরশিল্পের কাজ করে; তাদের পণ্যের বিপণন ও উপযুক্ত দাম নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে। আমরা প্রথমে দেখেছিলাম, এসব পণ্য বিক্রি করার জায়গা নেই। গ্রামে কুটিরশিল্পজাত পণ্য তেমন একটা বিক্রি হয় না। এগুলো বিপণনের জন্যই আমরা আড়ং প্রতিষ্ঠা করলাম। প্রতিষ্ঠানটি এখন গোটা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। এর আদলে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। এটিকে আমরা নিয়েছিলাম সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে। এতে মুনাফা যে সবসময় আসবে, তা কিন্তু নয়। যদি মুনাফা করতে পারে, তাহলে ব্যবসাটি টিকে যাবে। আড়ং মুনাফা করতে পেরেছে এবং টিকে গেছে। এমন আরো সামাজিক ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছি। ব্র্যাক ব্যাংকও শুরু করেছিলাম মূলত এজন্যই। মধ্যপর্যায়ের উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা জোগাতে পারলে বাংলাদেশে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। ব্র্যাক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সামাজিক কাজে ব্যবহার করা হবে।

ভবিষ্যতে বিভিন্ন রকম বিনিয়োগের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে এ ধরনের অনেক খাতে বিনিয়োগ করা যায়। বীজ বহুমুখীকরণের কথাই বলি। যেমন হাইব্রিড শস্যবীজ বাংলাদেশের কৃষিতে বড় অবদান রাখছে, তার ব্যবসা আমরা শুরু করেছি এবং ভালো করছি। পোলট্রি, ফিড মিল প্রভৃতিতে বিনিয়োগ রয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর দ্রুত উন্নয়নের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। এসব ব্যবসা আমরা করছি। তবে লক্ষ্য হলো উন্নয়নমূলক; লাভ এখানে মুখ্য না। লাভজনক প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তির অংশ নেই, সব অংশীদারিত্ব ব্র্যাকেরই। এখানে মুনাফা যতটুকু হয়, সেটি আবার দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয় হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তিমালিকানা নেই।

ব্র্যাক পরিচালিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা কী?

এসব কর্মসূচি খুব ভালোভাবেই চলছে। প্রতি বছর আমরা প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করি। এটি ব্যয় হয় প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষায়। আমাদের স্কুলসংখ্যা ৪০ হাজারের ওপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছি। দাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহায়তার পাশাপাশি আমাদের লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে মুনাফা আসে, তা থেকেও আমরা শিক্ষা কর্মসূচিতে অর্থায়ন করি। স্বাস্থ্য খাতেও আমাদের অনেক কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন, মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, শিশুদের পুষ্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখনো আমাদের দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি যাতে ঠিকমতো হয়, সেজন্য দেশের এক-তৃতীয়াংশ স্থানে আমাদের কর্মসূচি চলছে। পাশাপাশি যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি রয়েছে। ম্যালেরিয়া অবশ্য সারা দেশে নেই। মাত্র ১৭টি জেলায় এর ব্যাপকতা রয়েছে। সেসব জেলায় আমরা কাজ করছি। সুপেয় পানি, পয়োনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসম্মত প্রভৃতি বিষয় নিয়েও বাংলাদেশের ৩৫০টি উপজেলায় আমাদের কর্মসূচি রয়েছে। এসব উপজেলার সব গ্রামের প্রতিটি পরিবারে যাতে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা থাকে, সে ব্যবস্থা আমরা করছি। এগুলোই আমাদের বড় কর্মসূচি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের মনোযোগের ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করেন কি?

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের নজর যে একেবারে নেই, তা নয়। তাদের নজর রয়েছে। আমাদের সরকার তো দরিদ্র। দরিদ্র দেশের সরকারের অর্থসংকট থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই বেসরকারি সংস্থা হিসেবে আমাদেরও সম্পূরক কিছু কাজ করতে হয়।

এ কথা সত্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। বাংলাদেশে জিডিপির ২ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষা খাতে। আমি বলব, এটি খুবই অপ্রতুল কাজ। শিক্ষা খাতে ন্যূনতম সাড়ে ৩ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। প্রতিবেশী দেশ ভারতে এটি ৩ দশমিক ৯ ও থাইল্যান্ডে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। আমাদের অন্তত ৩ দশমিক ৫ শতাংশ হওয়া উচিত। এ পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হলে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একটা কথা বলব, আমাদের দেশে শিক্ষার মান উঁচু নয়। এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামো জোরদার করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অনেক কাজ বাকি রয়েছে। এজন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। শুধু শিক্ষকদের বেতন দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হবে না। দেশের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি কাজ করার দায়িত্ব সরকারের। বেসরকারি সংস্থাসহ সবার দায়িত্ব সরকারকে সহায়তা করা। ব্র্যাক সেটিই করছে, এর বাইরে কিছু নয়। মূল কাজটি সরকারকেই করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা স্থগিত করেছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদের ছয় মাস সময় বেঁধে দিয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী?

যেসব পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে, সেগুলো তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা দরকার। যেমন দ্রুত শ্রম আইনের সংশোধন হওয়া উচিত। বিদেশীদের যেসব পরামর্শ রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া চাই। তৈরি পোশাকশিল্পে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ নিতে হবে। এ দায়িত্ব যেমন সরকারের, তেমনি তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদেরও। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে এ খাতে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। আমি বলব, যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করা এক অর্থে আমাদের জন্য ভালো হয়েছে। এতে টনক নড়েছে আমাদের। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে। যুক্তরাষ্ট্রও তাই বলছে, বাংলাদেশের জন্য এটি সতর্কবার্তাস্বরূপ। আমাদের জন্য এটা সুযোগও বটে। অনেক দিন থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে বলে এলেও এক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়ায় তারা জিএসপি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে।

বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিনষ্ট হচ্ছে। আপনিও কি তা-ই মনে করেন?

হ্যাঁ, আমাদের রাজনীতি দেশের ওপর অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পক্ষে নয়। বর্তমান রাজনীতি থেকে দেশ যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হবে, ততই মঙ্গল। নতুন প্রজন্ম যদি ইতিবাচক রাজনীতি করে, তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশের এমন চেহারা থাকবে না। আমাদের দেশের রাজনীতি জনগণের ওপর বিরাট বোঝা। আশা থাকবে, এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত, দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। যদি রাজনীতিকরা একত্রে বসে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করেন, তাহলে অনেক সংকট থেকে জাতি মুক্ত হতে পারবে। সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন ঠিকমতো অনুষ্ঠিত ও একটি নতুন সরকার গঠিত হলে তবে বর্তমান ক্ষমতাসীন বা যে দলই দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আসুক, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান হবে বলে ধারণা। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনীতিকদেরই খুঁজে বের করতে হবে। সবাইকে ন্যূনতম ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। দেশ ও জনগণের মঙ্গলের বিষয়টি চিন্তায় রেখেই রাজনীতি করতে হবে।

অনুলিখন: জাহিদুল ইসলাম ও রানা আব্বাস